একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Ritwik Ghatak's 'Ayantrik': A poetic embodiment of philosophical statements

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক': দার্শনিক বক্তব্যের কাব্যিক রূপায়ণ

Name of the Author: Debruddha Bag

Affiliation: Research Scholar, Bengali Department, Visva-Bharati, West Bengal, India

Abstract: Literature-based cinema does not mean mere reproduction, imitation or an exact translation of literature. Rather, it respectfully embracing the core essence of the literary work and creatively reinterpreting it according to the filmmaker's vision. The artistic success of such adaptation depends on its practical distinction and harmonious execution. Remaining faithful to literary philosophy while expanding meaning through personal insights and worldly concerns, cinema transcends textual limits and becomes an independent artwork—a renewed, reimagined form of literature.

Subodh Ghosh's exceptional, timeless story 'Ajantrik' (1940). The author has revealed a new province of consciousness in this story, focusing on the inseparable dialectical relationship between humans and machines. Based on the story, Ritwik Ghatak wrote its screenplay with the same name in 1957. Although the basic story-structure of two art-forms is same, Ritwik has revealed the significant relationship between machine and life in a new understanding, guided by the 'Law of Life', scientific social thought and philosophical approach. The main topic of this article is the exploration and analysis of how he elevated the story to a poetic level through the originality of speech, innovative arrangement of subject, skilful form,the artistic quality of his philosophical and experimental work.

Keywords: Ritwik, Screenplay, Ajantrik, Jagaddal, Law of life, Dialectical relationship, New-construction, Poetic Transformation

ঋত্বিক ঘটকের ‘অযান্ত্রিক’: দার্শনিক বক্তব্যের কাব্যিক রূপায়ণ

দেবরুদ্ধ বাগ

ঋত্বিক ঘটকের অত্যন্ত চিন্তাশীল , সুসংবদ্ধ, ইতিহাস-সচেতন সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৭)। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের ব্যতিক্রমী গল্প 'অযান্ত্রিক'-কে (১৯৪০) অবলম্বন করে তিনি এর চিত্রনাট্য রচনা করেন। গল্পে প্রাগৈতিহাসিক গঠন ও পৌরাণিক সাজসজ্জার একটা পুরানো ফোর্ড গাড়ি ও তার চালক বিমলের মধ্যেকার অযান্ত্রিক সম্পর্কের অন্তর-কাঠামোয় যে গভীরতর জীবনদর্শন তথা যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক প্রতিফলিত, তাকেই ঋত্বিক ভারতীয় সমাজজীবন , সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রচলিত মূল্যবোধের অনুষঙ্গে বিশ্লেষণ ও নতুন আঙ্গিকে ধরার চেষ্টা করেছেন 'অযান্ত্রিক'-এ। ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে যন্ত্র অমানবিকতার সমার্থবাহী। যন্ত্রসভ্যতার সম্ভাব্য পরিণতি আত্মিক নৈরাশ্য ও শূন্যতা। যন্ত্রকে নিয়ে এই নেতিবাচক ও রক্ষণশীল মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজ ও ইতিহাস-সচেতন দার্শনিকতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যন্ত্র ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সন্ধান ও নতুন ভাষ্য রচনা করলেন চিত্রনাট্যে; সভ্যতা বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়, 'law of life'-এর গতিসূত্রে। 'অযান্ত্রিক'-র মূল থিম এই 'law of life'। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের, জীবনের সম্পর্ক স্বাভাবিক, অচ্ছেদ্য, তাৎপর্যপূর্ণ। সভ্যতার উষাকাল থেকেই সেই ধারা অব্যাহত। এবং সে সম্পর্ক কেবল প্রয়োজনের নয়, মানবিক, মানসিক কিংবা প্রেমেরও হতে পারে। এই হল কাহিনির মূল বক্তব্য।

ঋত্বিক নিজেই 'অযান্ত্রিক'-কে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের আখ্যা দিয়েছেন। ‘পরীক্ষামূলক’ বলতে বোঝায় মানবমন ও মানবসমাজের মধ্যে নব সম্পর্কের অনুসন্ধান , আঙ্গিকের অবকাশ বাড়িয়ে নতুন আয়তনের পরিধিতে তুলে ধরা। মূল বক্তব্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকেও তার গুণগত পরিবর্তন ও নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। 'অযান্ত্রিক' চিত্রনাট্যে ঋত্বিক বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক - উভয় দিকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নিজেই বলেছেন:

> ‘অযান্ত্রিক-এ আমি মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভালোবাসা নিয়ে পরীক্ষা করেছি।’[১]

এই পরীক্ষা তিনি চিত্রনাট্য কিংবা চলচ্চিত্র নির্মাণের তাগিদেই করেননি, করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু রচনা করে সামাজিক বিবর্তন , ভবিষ্যৎ ভারতের পথ-নির্মাণের প্রয়োজনে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পী হিসেবে:

> ‘কোনো কিছু সৃষ্টির সময়ে, সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এবং তা যেন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে থেকে মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।’[২]

সেই অন্তর্গত উদ্দেশ্যে প্রচলিত রীতির বাইরে সাহিত্যকে প্রতিচিত্রণের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে দেশ ও দশের কথা মাথায় রেখে তিনি ‘অযান্ত্রিক’-এ জীবন নিয়ে , ইতিহাসের অগ্রগামী ধারা নিয়ে পরীক্ষা করেন। সাহিত্যিকের মূল বক্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও গ্রহণ-বর্জন ও রূপান্তরের মধ্যদিয়ে বক্তব্যকে অন্যস্তরে পৌঁছে দেন। জরাভারে জীর্ণ , কদর্য জগদ্দলের প্রতি চালক বিমলের মমত্ববোধ কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয় হলেও

চিত্রনাট্যে এমন অনেক বিষয় , ঘটনা, চরিত্র কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ পাই , যা সুবোধ ঘোষের মূল গল্পে অনুপস্থিত। সেইদিক থেকে 'অযান্ত্রিক' চিত্রনাট্যটি সাহিত্যের নবনির্মাণ। বক্তব্যের মৌলিকতা , বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, দক্ষ আঙ্গিক নির্মাণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর কারুকৃতিতে তা হয়ে উঠেছে নতুন সাহিত্য। 'অযান্ত্রিক'-এ বক্তব্যের নতুনত্ব নিয়ে সমালোচক মারী সীটন বলেছেন:

> "অযান্ত্রিক'য়ে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্ব স্থান পেয়েছে যা এর আগে এত সুস্পষ্টভাবে পর্দায় রূপায়িত হয়নি ; ... এই ছবিটি আধুনিক যুগের আগমন সূচিত করেছে -সূচিত করেছে ভারতবর্ষের প্রস্তর যুগ ও আনবিক যুগের সহাবস্থান। ভারতীয় বাস্তববাদের পটভূমিকায় এর পরিচালক যন্ত্রের সঙ্গে জীবনের একাত্মতা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।'[৩]

যে দরদী শিল্পীমন নিয়ে ঋত্বিক 'অযান্ত্রিক'-এর অভিনব বিষয়টিকে শৈল্পিক উপস্থাপনায় ধরেছেন , তা বিশ্ব-চলচ্চিত্রে বিরল। বক্তব্যের মৌলিকতা ও ঋজুতায় , অসাধারণ প্রকাশরীতি, চমৎকার আঙ্গিক সৌষ্ঠব এবং নিরীক্ষাকর্মের মানবিক গুণে তিনি সুবোধবাবুর গল্পটিকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছেন । গল্পের 'জগদ্দল' মানবিক অভিব্যক্তিতে সিনেমায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। চিত্রনাট্যে সে 'মানুষের মত' নয়, পরিপূর্ণ 'মানুষ'। বিমল তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করে। ফরাসি চিত্র-সমালোচক জর্জ সাঁদুল 'অযান্ত্রিক'-এর নতুনত্ব ও আঙ্গিকনৈপুণ্যে সম্মোহিত হয়ে অষ্টাদশ শতকের লেখন টরমেসের 'লাজারিলো' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা টেনে তাকে 'একটি অসাধারণ চিত্রধর্মী উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৪] শুধু সাঁদুলই নন, সমালোচক অরুণকুমার রায়, বিমল ভৌমিক কিংবা চলচ্চিত্র-স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় 'অযান্ত্রিক'-এর বিষয়বস্তু, দৃশ্যবিন্যাস ও কমপোজিশন-এর আন্তরিক কাব্যধর্মীতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়:

> 'যে সমস্ত গুণগুলো থাকলে একটা ছবি সত্যিকারের সার্থকতা অর্জন করতে পারে সেই ধরনের চলচ্চিত্রের কতকগুলো বিশেষ গুণ 'অযান্ত্রিক'-এ প্রায়ই বহু জায়গায় লক্ষ করা যায়।... এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে কতকগুলো শট, যেখানে ঘটনা হয়তো কিছুই ঘটছে না , উপাদান সামান্যই। কিন্তু একটা বিশেষ context-এ এসে সেই শট এমন একটা কাব্যের পর্যায়ে উঠে গেছে , এমন একটা শক্তিশালী চেহারা নিয়েছে যেটা একমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব।... তার দৃষ্টিকোণ , তার composition এমন আশ্চর্য, সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট কথা বলছে।' [৫]

'অযান্ত্রিক'-র বিশিষ্টতা সম্পর্কে সমালোচক বিমল ভৌমিক বলেছেন:

> "রচনাশৈলীর মৌলিকতায় 'অযান্ত্রিক'-এর চিত্রনাট্য নিঃসন্দেহেই অভিনব। সংক্ষিপ্ত সংলাপ ও সংযত বিন্যাসের গুণে 'অযান্ত্রিক'-এর চিত্রনাট্য যে শিল্পসাফল্য লাভ করেছে , তাতে দ্বিরুক্তি করা চলে না। ... বাস্তবতার সঙ্গে কাব্যধর্মের সুসঙ্গত মিল ঘটিয়ে পরিচালক 'অযান্ত্রিক'-কে একটি শিল্প করে তুলতে পেরেছেন।" [৬]

শুধুমাত্র শিল্পী-সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাতেই নয় , আমরা যদি চিত্রনাট্যের অভিনব বিষয়বিন্যাস , আঙ্গিকের প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও সিচুয়েশনে-নির্ভর আবহ , সংগীতের ব্যবহার বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব , 'অযান্ত্রিক'-এর প্রতিটি দৃশ্যে সেই শিল্পসুষমা, কাব্যিকতা, সাহিত্যরস বিচ্ছুরিত।

চলচ্চিত্রের প্রথম কয়েকটি দৃশ্যে ঋত্বিক শব্দ ও দৃশ্যগত মনতাজ , অসাধারণ কমপোজিশন ব্যবহার করে কাহিনির পটভূমি, প্রেক্ষাপট, কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমল ও তার অদ্ভুতকর্মা জীবন্ত গাড়িটিকে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। গল্পে যা ছিল বর্ণনায়-অনুভবে , চিত্রনাট্যে জগদ্দলের সেই অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা প্রত্যক্ষ করি । শুধু তাই নয়, গল্পের পরিধির মধ্যে বিবাহ প্রার্থী ভাগনে ও মামার উপকাহিনী এনে তিনি বক্তব্যের নতুনত্ব ও সেই অনুযায়ী তার রূপরীতিগত স্বাতন্ত্র্যম্, কাহিনির ছন্দ ও মূল সুরটি স্পষ্ট চিহ্নিত করে দেন। সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ গল্পের শুরুতে বিমল ও তার অদ্ভুতকর্মা জগদ্দলের পরিচয় করিয়েছেন এইভাবে:

'বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড-প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্ব্বাঙ্গে একটা কদর্য্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে যদিও জবুথবু কিন্তু কাজের বেলায় বড়ই অদ্ভুত-কর্মা বিমলের এই ট্যাক্সি। বড় বড় চাঁইগাড়ীর পক্ষে যাহা অসাধ্য , তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে-ঘোর বর্ষার রাত্রে- যখনই ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়ীই নারাজ , তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি।'[৭]

ঋত্বিক কাহিনির বিমল ও তার স্নেহের গাড়িটিকে দৃশ্যলোকে আনার আবহ তৈরি করলেন শুরুতেই সংযত, ইঙ্গিতপূর্ণ কাব্যিক ব্যঞ্জনায়:

Fade In

স্টেশন চত্বর। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। বর -সাজে সজ্জিত ভাগনে তরণী অট্ট হেসে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে মামা। তরণীর হাতে টোপর। সে হাসছে। আবহে ওঁরাওদের সমবেত গান ও মৃদু মাদলের ধ্বনি।

মামা : কী ভাবলি রে?

তরণী : এ... এ... কোথায় তো একটা এসে পড়লাম। তা এখন যাবো কী করে?

মামা : কেন ট্যাক্সি করে।

তরণী : কিন্তু ওই টিকিট বাবু যে বলল পথ ভয়ঙ্কর!

মামা : ধ্যাৎ... টিকিট বাবুর কী , তিনি তো বলেই খালাস। তাকে তো সন্ধ্যের মধ্যে গিয়ে বর পৌঁছে দিতে হবে না! পৌঁছে দেব বলে নিয়ে বেরিয়েছি, পৌঁছে দেব।

তরণী : কিন্তু আকাশ যে ও দিকে একেবারে মিশকালো!

মামা তরণীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়...

মামা : তুই থাম।

মামা ট্যাক্সির খোঁজে এগোয়। সামনে ছাতা মাথায় বুলাকি পাগল এসে পড়ে। মামা তার কাছে ট্যাক্সির খবরাখবর জানতে চায়...

মামা : এই এই এখানে একটা ট্যাক্সি...

বুলাকি : ধুর...

পাগলের ধমকে মামা-ভাগনে ভয়ে ছিটকে সরে যায়।

বুলাকি : ছাতিটা পাওয়া গেছে, গামলা আর ভিজবে না।[৮]

মামা-ভাগনের অন্তর্ভুক্তিতে চিত্রনাট্যের প্রথমেই নতুন মাত্রা যুক্ত হল । মামা ট্যাক্সির খোঁজে স্ট্যাণ্ডে গেলে ঝালপুরের 'পথ ভয়ঙ্কর' - এই অজুহাতে অন্য ড্রাইভাররা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। নিরাশ মামা-ভাগনে পাশের দোকানের রোয়াকে বসে যে কথাবার্তা বলে তাতে তাদের মধ্যেকার স্বার্থপর সুবিধাবাদী সম্পর্কের ছাপ স্পষ্ট। চিত্রনাট্যে বিমল-জগদ্দলের আত্মিক সম্পর্কের বিপরীতে মামা-ভাগনের এই সম্পর্ককে ঋত্বিক ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ব্যবহার করেন প্রতিপাদ্য বক্তব্যের প্রয়োজনে। গল্পে জগদ্দলের প্রতি বিমলের আচরণ , স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য সবই অপরাপর বাইরের মানুষের কাছে ব্যতিক্রমী, বেমানান। তাই সে পাগল, অস্বাভাবিক, যন্ত্র। ঋত্বিক সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণটিকে উলটো ঘুরিয়ে দিলেন। সেইসব স্বাভাবিক মানুষদের হাজির করলেন তাদের অন্তর্গত স্বার্থপরতা , সুযোগসন্ধানী, তোষামুদে, ঠকামি, 'তিকড়াম বাজি'র স্বভাববৈশিষ্ট্যে। তরণী নিজের মামাকেই বিশ্বাস করে না , কারণ সুযোগ পেলে সেও কেটে পড়তে পারে। বিমল-জগদ্দলের মধ্যে ভালোবাসা , বিশ্বাসের যে স্বাভাবিক নিবিড় বন্ধন তার বিপরীতে মামা-ভাগনেকে এনে ঋত্বিক ব্যঙ্গ করলেন সেইসব 'কথিত' স্বাভাবিক মানুষদের ভেজাল স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তিকে। কিশোর সুলতান , যে বিমলেরই একটি সত্তা , বিমলকে সবচাইতে বেশি বোঝে, ভদ্রবেশী মামা-ভাগনের অস্বাভাবিক আচরণে মজা পায়। বিমলরা এখানে অবজারভার। পরবর্তী কাহিনিতে আসা একাধিক যাত্রীদের অস্বাভাবিকতাকে তারা অবজারভ্ করে। বক্তব্যের একটি অন্যতম ভাবের ইঙ্গিতকে ঋত্বিক গভীর ব্যঞ্জনায় ধরিয়ে দেন। মামার দুরবস্থায় ত্রাতা হয়ে আসে এই সুলতান। বড় মিস্ত্রি গৌরের কথায় সে মামাকে বিমলের কাছে নিয়ে যায়। কাহিনির সকল টাইপধর্মী চরিত্র প্রথম দৃশ্যে উপস্থিত। মামা-ভাগনে কিংবা সুলতানের প্রসঙ্গ গল্পে নেই।

বিমল যে অন্যদের থেকে পৃথক , একগুঁয়ে, অস্বাভাবিক, একাকী - পরবর্তী দৃশ্যে তার বাসস্থান ও মামার সঙ্গে কথোপকথনে খানিক স্পষ্ট হয়ে যায়। সভ্যসমাজের বাইরে গোরস্থানের পাশেই তার বাস। মদ্যপান করে , এক কথার মানুষ , ছলনা, প্রবঞ্চনার ধার ধারে না। সুলতানের কথায় 'বেজায় বদরাগি'। পরবর্তী দৃশ্যে ঋত্বিক অদ্ভুতকর্মা জগদ্দলকে দৃশ্যলোকে আনেন। ভাঙাচোরা গঠন , চেহারা-চরিত্রে অদ্ভুতশ্রী। তার ভৈরব হর্ষে মামা-ভাগনের বুকে কাঁপন ধরে। পথচারী দৌড়ে পালায়। ভাগনে জগদ্দলকে 'কাঁকলাস' বললে সুলতান তাকে 'জবান সামনে' চলতে বলে। কারণ পরের মুখে জগদ্দলের আলোচনা , অপমান বিমল কিছুতেই সহ্য করে না। পরবর্তী দৃশ্যে দু'জনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার ঘটনায় তার প্রমান পাই। জগদ্দলের হালচালে তরণী যখন তার কর্মক্ষমতায় সন্দিগ্ধ, তখন প্রথম প্রচেষ্টায় জগদ্দল গর্জে ওঠে। গাড়ির শব্দে মামা-ভাগনের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম, তা অপূর্ব দৃশ্য-ব্যঞ্জনায় ঋত্বিক বুঝিয়ে দেন। পথচারীর কাছে গাড়িটি যে মূর্তিমান বিভীষিকা – তা গাড়ির শব্দে পাগলের জড়সড় হয়ে যাওয়া কিংবা পথচারীর বিপন্ন দৌড়াদৌড়িতে ধরা পড়ে। দৃশ্যটি অসাধারণ কাব্য ব্যঞ্জনাময়। 'মানুষ' জগদ্দল কিংবা বিমলের চরিত্র ও স্বভাববৈশিষ্ট্য চিত্রনাট্যে একাধিক দৃশ্যেজুড়ে উন্মোচিত হয়। অদ্ভুত কর্মক্ষমতায় ঘোর দুর্যোগে ভয়াবহ

ভাঙাচোরা জংলীপথ, বিপজ্জনক পাহাড়ী ঘাট, তিনটি বড় ঝর্ণা পেরিয়ে জগদ্দল সময়ের আগে মামা-ভাগনেকে বিবাহ বাসরে পৌঁছে দেয়।

চিত্রনাট্যে ঋত্বিক অনন্য দৃশ্যবিন্যাস , অসাধারণ কমপোজিশন ও ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে জগদ্দলের জীবন্ত, অনুভূতিশীল সত্তা ও বিমলের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্কটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিয়ে বাড়ি ছেড়ে বিমল ফিরে আসছে নিজের গন্তব্যে। ছোটনাগপুরের দিগন্ত প্রসারিত উঁচু-নীচু মালভূমির মাঝবরাবর সিঁথির মত পথ। জগদ্দল প্রমত্ত বেগে যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে। দূরে একপাল গরু পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। জগদ্দল থেমে যায়। এক গো-শাবক তার মায়ের দুগ্ধ পান করছে। জগদ্দলের চোখ দুটি সেইদিকে তাকিয়ে। তার বুক থেকে ভেসে আসে অদ্ভুত ধুকপুক শব্দ। বিমল নিমেষেই জগদ্দলের কষ্ট বুঝে ফেলে। তাই, কিছুদূর এগিয়ে একটা ঝিলের পাশে দাঁড় করিয়ে সে জগদ্দলের মুখে ঢেলে দেয় এক ক্যান জল। বিমলের জল আনার ভঙ্গিটি যেন শিশুকে ভুলিয়ে খাওয়ানোর। জগদ্দল মানবিক শব্দে জলপান করে, তৃপ্ত হয়। এরপর বিমল খানিক জিরিয়ে নিতে জগদ্দলের ছায়ায় বসে পড়লে সে অদ্ভুত শব্দ করে রাগ দেখায়। বিমল বুঝতে পারে রাগের কারণ। ফলত , চটপট হাতের কাপড়টা জগদ্দলের হেড লাইটে ঢাকা দিতেই সে শান্ত হয়। সমগ্র দৃশ্যের কমপোজিশন ও বিন্যাস গভীর ব্যঞ্জনাময়, কাব্য-সুষমামণ্ডিত।

পরবর্তী দুটি দৃশ্যে জগদ্দলের প্রতি বিমলের প্রতিজ্ঞা , তার বিরুদ্ধে দুনিয়ার ষড়যন্ত্র , তার পরিচর্যা ও জগদ্দলের অদ্ভুত কর্মকুশলতায় সমব্যবসায়ীদের ঈর্ষার প্রসঙ্গগুলি ঋত্বিক গল্পের স্বাধর্ম বজায় রেখে চিত্রনাট্যে ধরেছেন। এর সঙ্গে অভিপ্রেত বক্তব্যের প্রয়োজনে ঋত্বিক জগদ্দলের প্রতি অসীম কৌতূহলী এক শিশু , বিমলের সাফসুফো হয়ে নতুন পাঞ্জাবি ও মালকোঁচা ধুতি পরে ফটো তুলতে চাওয়ার বাসনা ও এক সদ্য-বিবাহিতা মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে আসার প্রসঙ্গ যুক্ত করে কাহিনিতে গভীর কাব্যিক ব্যঞ্জনা এনেছেন। কৌতূহলী শিশুটি বিমলের ভবিষ্যৎ সত্তা। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কাহিনিতে তিনবার এসেছে। তিনবারই লক্ষ করি যন্ত্রের প্রতি তার গভীর প্রেম। জগদ্দলকে ধুয়েমুছে বিমলের প্রায় বর-বেশে ফটো তুলতে চাওয়ার বাসনায় এক গভীর ব্যঞ্জনা প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ঋতবান ঘটক বলেছেন:

> ‘মামা-ভাগ্নেকে বিয়ের বাসরে পৌঁছে দিয়ে বিমলের মনের ভাব আসে নতুন পোশাকে নিজেকে এবং জগদ্দলকে সাফসুফ করে ফোটো তোলার বাসনা-এ শুধু বাঙালির তৎকালীন বিবাহ-ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করা হল না, নিজের চপলতাকে ওই বিচিত্র ট্যাক্সিস্ট্যান্ডবাসীদের সঙ্গে জারিয়ে নেওয়া হল।’[৯]

বিমলের অভিব্যক্তিতে যে ভাব ফুটে ওঠে তা পূর্বের দৃশ্যে বরবেশী তরণীর অস্বাভাবিক আচরণ ও ছদ্ম বিবাহ-ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করে। সমাজসৃষ্ট বন্ধনগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র বন্ধন বিবাহ। দুটি প্রাণ অপরিসীম ভালোবাসা ও নিবিড় বিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আজীবন। পারিপার্শিক বাধাবিঘ্নকে জয় করে এই প্রবাহ যুগ-যুগান্ত ধরে বয়ে চলেছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিবিড় সম্পর্কে ভর করে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক সমাজদর্শনে বিবাহে আত্মিক বন্ধনের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে পারিপাশ্বিক অনুষঙ্গ। সেই দর্শনবোধে লালিত আত্মিক-বন্ধন বিচ্ছিন্ন, কৃত্রিম বিবাহ-ইচ্ছার পরিণতি কী ভয়ঙ্কর হতে পারে , তার নিদর্শন দেখি পরবর্তী দৃশ্যে। চপল-উচ্ছ্বসিত, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সদ্য-বিবাহিতা যে হাসি কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকের সঙ্গে মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল ,

প্রয়োজন পুরণের পর সেই প্রেমিক-ই তাকে ছুঁড়ে ফেলে পালায়। এর বিপরীতে বিমল ও জগদ্দলের মধ্যেকার যে আত্মিক-ভালোবাসা ও গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক, তার কাছে ছদ্ম সমাজ-প্রচলিত বিবাহ বন্ধন এতটাই ছোটো হয়ে পড়ে যে তা কেবল ব্যঙ্গ ও উপহাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। [১০] তাই, মামা কিংবা হাসির প্রেমিকের উপস্থিতি জগদ্দল ও বিমলের কাছে উৎকট ঠেকে। হাসির করুণ পরিণতি পাশে বিমল ও জগদ্দলের অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি এনে ঋত্বিক অপরীসীম ব্যঞ্জনায় প্রচলিত সমাজ-চিন্তাকে যেমন বিদ্রুপ করেন , তেমনি ইতিহাসের গতিপথটি চিহ্নিত করে দেন। কারণ, ইতিপূর্বেই দেখেছি ডাকবাংলো থেকে ফেরার পর বিমল তার জীবনে জগদ্দলের ভূমিকা ও তার প্রতি জগতের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে কিশোর সুলতানের কাছে , যে জগদ্দলকে বোঝে। জগদ্দল তার মায়ের প্রতিমূর্তি। তার সঙ্গে বিমলদের সম্পর্ক সেই আদি কাল থেকেই , স্বাভাবিক ও অচ্ছেদ্য। এর পরেই আসে সেই স্বাভাবিক সম্পর্কের বিস্তার পর্ব , যেখানে এক শ্রমিক রমণীকে দেখি খনি ও কারখানা অঞ্চলে। যাদের প্রাত্যহিক জীবনে যন্ত্রের সঙ্গে একাত্মতা অস্বাভাবিক নয়। সমগ্র দৃশ্যপর্যায়টি কাব্যময় উপলব্ধিতে ধরা পড়ে।

যন্ত্রের সঙ্গে জীবনের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য , আবহমান কালের এবং জীবনের প্রবহমানতায় সবকিছুই যে পুনরাবর্তময়-এই জীবনসত্যটিকে ইঙ্গিতময়তায় ধরতে ঋত্বিক চিত্রনাট্যে একাধিক দৃশ্যে ভিন্ন দৃষ্টিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিংবা প্রতীক ব্যবহার করে বক্তব্যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা এনেছেন। মামা-ভাগনেকে বিবাহ-স্থানে এবং হাসি ও তার প্রেমিককে ডাক-বাংলোয় পৌঁছে দিতে জগদ্দল একই পথে গেছে , যেখানে রাস্তার পাশে পাগল বসে থাকে। প্রথমবার জল ছিটিয়ে ও দ্বিতীয়বার ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। কিংবা , বিশাল উন্মুক্ত উঁচুনীচু ঢেউখেলানো প্রান্তর পেরিয়া সচল জন-মানুষে পূর্ণ একটা আদিবাসী বাজারের মধ্যে দিয়ে বিমল হাসি ও দীপককে ডাক-বাংলোয় পৌঁছে দেয়। সেই বাজারে দাঁড়িয়ে হাসি একটা চিরুনি কেনে , যেটা সে কোনও দিন হারাতে চায় না। এর মূল্যায়নে দীপক বলে - 'আর কী সস্তা! মাত্র চার আনা।' পরে একদিন সেই প্রেমিক-পরিত্যক্তা অসহায় হাসিকে নিয়ে বিমল একই পথে ফিরে আসে। তখন বাজার জনমানব শূন্য , আর আবহে আগের যাত্রার মাদলের ধ্বনি পুনশ্চ শুনি অত্যন্ত চড়া স্বরে। হাসি যখন প্রথম বিমলের যাত্রী হয়ে অতি-উচ্ছ্বাস ও স্বভাবজাত চাপল্যে জগদ্দলের হুডের কিছু অংশ ছিঁড়ে দেয় , তা বিমলকে আহত করেছিল। পরে বিমল যখন অসহায় অবস্থায় তাকে গাড়িতে তুলে বলে 'ওটা সেলাই করে দিয়েছি ... পুরোনো হুডের কাপড়টা', তখন হাসি চোখের জল মুছে লজ্জিত হয়। এইসব দৃশ্যগুলো চিত্রনাট্যে অপরিসীম কাব্যব্যঞ্জনা এনে দেয়।

আদিম প্রাণময়তার দর্শনে বিমল জগদ্দলের প্রতি অকৃত্রিম টান ও গভীর একাত্মতা অনুভব করলেও নশ্বর জাগতিক নিয়মকে সে সহজে মানতে চায়নি। তাই , জগদ্দলের দিন যত ঘনিয়ে আসে , ততই সে যেন তাকে অবুঝ বাৎসল্যে আষ্টেপৃষ্টে বুকে আগলে রাখতে চায়। জগদ্দল অবিনশ্বর , যতদিন সে আছে-এই বিশ্বাসবোধে মগনলালের তোফা ছ-সিলিন্ডার সিডানের প্রস্তাব তার কাছে ঝঞ্ঝাট মনে হয়। বিমলের অনমনীয় মনে প্রথম আঘাত দেয় কাদাছোঁড়া বাচ্চার দল। তবু সে অনড়, প্রবল প্রতিস্পর্ধায় প্রতিজ্ঞা করে, 'কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল, তুই আর আমি আছি'। যেখানে ভালোবাসা নিবিড়, সেখানে টান তত প্রবল। আবার সে প্রবল টানে সেই ভালোবাসাকে ক্ষতবিক্ষত করার সম্ভাবনাও ক্ষেত্রবিশেষে উৎকট হয়ে ওঠে। জগদ্দলের প্রতি বিমল

তা-ই করে বসল। হাসির ফেলে যাওয়া কাঁকইটা ফিরিয়ে দিতে বিমল জগদ্দলের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করল। পরিণতিতে জগদ্দল বিকল হয়ে পড়ে। এবার ওঁরাওদের জন্ম-শিকার-বিবাহ-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ভাবদ্যোতক মহাযাত্রার দৃশ্য দিয়ে বিমলের চেতনায় আঘাত করা হল। জগদ্দলের প্রতি তার আচরণের ভুল বুঝতে পারলেও জগদ্দলের অবিনশ্বরতায় বিমল এখনও অনড়। বুলাকি যে গামলাটিকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখত , সেটাও বিমলের চোখের সামনে গাড়ির চাকায় পিষে নষ্ট হল। তবু বিমল তার সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে টেনে সারিয়ে তুলতে উদ্‌গ্রীব।

বড়মিস্ত্রির যাবতীয় সাবধানতা উপেক্ষা করে যথাসর্বস্ব দিয়ে সে জগদ্দলের পরিচর্যা শুরু করল। জগদ্দল সারল বটে কিন্তু তার রোগ গভীর। বড়মিস্ত্রি সে-কথা বুঝতে পারে। এবার বিমলের মনেও খানিক শঙ্কার মেঘ। তাই, শেষ পরীক্ষা করে নিতে চায়। জগদ্দল থাকবে না যাবে? পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় শেষমেশ জগদ্দলের শায়েস্তার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তাতেও বিমল হতাশ। তাকে আর ফেরাতে পারে না। তার যাবতীয় বিশ্বাসভঙ্গ ও অজস্র কান্নার পর বিমল স্বীকার করে , জগদ্দল 'লোহার বাচ্চা'। কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস সহজে যাবার নয়। রাগে-শোকে জগদ্দলকে মন-দরে বিক্রি করেও ভুলতে পারে না তার শোক। এরপর আমরা দেখি অসাধারণ এক কাব্যব্যঞ্জনাময় দৃশ্য। পুরানো গামলার বদলে নতুন গামলা ফিরে পাবার আনন্দে পাগল আত্মহারা। সুলতান তার পুরানো গামলার কথা জানতে চাইলে বুলাকি বলে সেই 'বিচ্ছিরি' গামলার কথা সে কবেই ভুলে গেছে। এখন তার যাবতীয় ধ্যান নতুন চকচকে গামলার প্রতি। শেষ দৃশ্য, এবার জগদ্দলের বিদায়ের পালা। বুকে কান্না চেপে জগদ্দলকে 'ভালো মনে' বিদায় দেবার কথা বলেও বিমল পারে না। গাড়িটার বিচ্ছিন্নকরণের শব্দ তার অসহ্য ঠেকে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে জগদ্দলের সমাধি খনন শেষ। এখন মহাপ্রস্থানের পালা। আড়ষ্ট বিমলের সামনে দিয়ে মারোয়াড়ির লোকজন জগদ্দলের শব নিয়ে চলে গেল। বিমল নিশ্চল। হঠাৎ ভেসে আসে জগদ্দলের সেই পুরানো গলা। বিমল দেখে সেই কৌতূহলী বাচ্চাটির হাতে জগদ্দলের বাঁশি। বিমল এক অন্য উপলব্ধির হাসিতে ভুলে গেল জগদ্দলের শোক। চোখে তার আনন্দাশ্রু। আবহে বেজে ওঠে মাদলের ধ্বনি, আদিবাসীদের সমবেত সংগীত। গোটা দৃশ্যটি গভীর ব্যঞ্জনায় আমাদের একটা চিরন্তন ভাবে উন্নীত করে।

'অযান্ত্রিক' চিত্রনাট্যে আমরা কয়েকটি শব্দ ও দৃশ্য প্রতীকের ব্যবহার দেখি , যা সামগ্রিক বক্তব্যের অর্থদ্যোতনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জগদ্দলকে দৃশ্যলোকে আনার পূর্বে সুলতানের সঙ্গে মামা বিমলের আস্থানায় যাওয়ার সময় গির্জার ঘণ্টা ও করবস্থানে এক ওঁরাও রমণীর মৃত সন্তানের প্রতি বিলাপ শুনি। দ্বিতীয়বার বিমল যখন জগদ্দলকে টেনে সারিয়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় রাতজেগে জেনুইন স্পেয়ারপার্টস্-এর লিস্ট করছিল তখন একবার গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনি ও কবরস্থানে ক্রশচিহ্নের পাশে বসে সেই নারীকে কাঁদতে দেখি। এরপর জগদ্দল যখন সমস্ত পরীক্ষায় ফেল করে ও বিমল কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ও সমবেত আদিবাসী সংগীত শুনি। তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিন ধরণের শব্দ ও দৃশ্য প্রতীক ব্যবহার করে ঋত্বিক জগদ্দলের সমগ্র জীবনচক্রটিকে গভীর দার্শনিকতা ও কাব্যময়তায় তুলে ধরেন।

সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণে আমরা দেখলাম চলচ্চিত্রনির্মাতার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি , ইতিহাস-চেতনা, দার্শনিকতা ও কাব্যধর্মের অপূর্ব সংমিশ্রণে 'অযান্ত্রিক' আবেদন ও উপলব্ধিময়তায় মূল গল্পকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়। তা শুধু চলচ্চিত্রীয় বিনোদন কিংবা নান্দনিক আখ্যানধর্মিতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের বাস্তব জীবনবোধে দীক্ষিত ও প্রকৃত ইতিহাস-সচেতক হতে অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চিত্রনাট্য তথা চলচ্চিত্র বক্তব্যধর্মিতায় হয়ে ওঠে ইতিহাসের পুনঃপ্রস্তাব; নতুন সাহিত্য।

সূত্রনির্দেশ:

১. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পা:, প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক: সামগ্রিক মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র চর্চা, সংখ্যা ২৫, নভেম্বর ২০১৭, কলকাতা, পৃ: ৬০।
২. ঘটক, ঋত্বিককুমার, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং আমি, চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫, কলকাতা, পৃ: ১৫৭।
৩. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পা:, প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক: সামগ্রিক মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র চর্চা, সংখ্যা ২৫, নভেম্বর ২০১৭, কলকাতা, পৃ: ২৫৭-৫৮।
৪. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পা:, প্রসঙ্গ: ঋত্বিককুমার ঘটক চলচ্চিত্র সমালোচনা, চলচ্চিত্র চর্চা, বইমেলা ২০১৮, কলকাতা, পৃ: ২৮৭।
৫. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পা:, প্রসঙ্গ ঋত্বিককুমার ঘটক: সামগ্রিক মূল্যায়ন, চলচ্চিত্র চর্চা, সংখ্যা ২৫, নভেম্বর ২০১৭, কলকাতা, পৃ: ২৪২।
৬. মুখোপাধ্যায়, বিভাস সম্পা:, প্রসঙ্গ: ঋত্বিককুমার ঘটক চলচ্চিত্র সমালোচনা, চলচ্চিত্র চর্চা, বইমেলা ২০১৮, কলকাতা, পৃ: ২৯৩-৯৫।
৭. ঘোষ, সুবোধ, অযান্ত্রিক, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশভবন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ. ১৭
৮. ঘটক, ঋত্বিক, অযান্ত্রিক চিত্রনাট্য, ডিভিডি থেকে নির্মিত।
৯. রুদ্র, সুব্রত সম্পা:, সেই ঋত্বিক, প্রতিভাস, ২০২০, কলকাতা, পৃ: ১২৩।
১০. তদেব, পৃ: ১১৮।